দেশে দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন

Climate Change Around the Globe

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
বাংলাদেশ

দেশে দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন

নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা
প্রকাশক
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
জাতিসংঘ অফিস, আইডিবি ভবন
বেগম রোকেয়া সরণি, শের-ই-বাংলানগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০৭
শিল্প নির্দেশনা : সন্তু সাহা
ইউনিক/প্রকাশ/২০০৭/০৭-১০০০
গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রোডাকশন
হোপ মাল্টিমিডিয়া

Climate Change Around the Globe

Executive Editor : Kazi Ali Reza
Published by
United Nations Information Centre, Dhaka
UN Office, IDB Bhaban
Begum Rokeya Sharani
Sher-e-Banglanagar
Dhaka-1207, Bangladesh
Published in November 2007
Art Direction : Santu Saha
unic/pub/2007/05-1000
Graphics & Production
Hope Multimedia

ভূমিকা

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হিসেবে জলবায়ুর পরিবর্তনকেই প্রধানত দায়ী করা হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খড়া, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ। বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং ব্যাপক বন্যা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনের আলামত হিসেবে অনেকে মনে করে থাকেন। জলবায়ুর পরিবর্তন বৈশ্বিক বিষয় হলেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো এর পরিণতি বেশি মাত্রায় ভোগ করে থাকে। এক হিসাবে বলা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা সামান্য বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ উপকূলীয় অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে। কোটি কোটি মানুষ হবে পরিবেশ শরণার্থী। ক্ষতি হবে ফসলের, বৃদ্ধি পাবে খাদ্যাভাব ও রোগশোক, বাধাগ্রস্ত হবে উন্নয়ন উদ্যোগ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা MDG অর্জন করতে হলে জলবায়ুর এই পরিবর্তন রোধে আমাদের সবাইকেই উদ্যোগী হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল পর্যায়ের এবং সকল স্তরের মানুষের সচেতনতা ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

জাতিসংঘ জলবায়ুর পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান দিয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন (UNFCCC) বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে বৈশ্বিক প্রয়াসের সাথে একযোগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

জলবায়ুর এই পরিবর্তন সম্পর্কে বাংলাদেশের যুব ও ছাত্রসমাজকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে দেশে দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো। সহজ ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এটি রচনা করা হয়েছে। এতে সরকারি, বেসরকারি ও জাতিসংঘের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য-সকল স্তরের মানুষকে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করা।

আমাদের এ কাজে উলেস্নখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন ঢাকাস্থ UNDP'র শিরীন কামাল সৈয়দ। ছাত্র-ছাত্রীদের জলবায়ুর পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই পুস্তিকাটি সামান্যতম সহায়ক হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

কাজী আলী রেজা
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

দেশে দেশে জলবায়ুর পরিবর্তন

পৃথিবীর উষ্ণায়ন বা গে-াবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে দেশে দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। প্রশ্ন হলো পৃথিবীর উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে। এই উষ্ণতা বাড়ার মূল কারণ গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্ট ও উর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব কমে যাওয়া। ইউরোপের দেশগুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ-বের পর থেকে কলকারখানা, যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও পশুখামারগুলো বায়ুম□লে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও মিথেনসহ নানা গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। কাঠ, কয়লা, তেল এবং পরবর্তীকালে গ্যাস পোড়ানোর ফলে কার্বন-ডাই অক্সাইড বায়ুম□লে চলে এসেছে। এত দিন পৃথিবীর বনাঞ্চল ও সাগর এই গ্যাস আহরণ করে পৃথিবীকে মোটামুটি নিরাপদ রেখেছিল। কিন্তু বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক দেশে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে গাছপালা কমে যাওয়ায় কার্বন আহরণ প্রক্রিয়াও কমে গেছে। এ কারণে আবহাওয়াম□ল ক্রমাগত উষ্ণ হয়ে উঠছে এবং পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক বেড়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় খরা ও দাবানল, ব্রিটেনে প্রলয়ঙ্করী বন্যা, পাকিস্তানে আকস্মিক পাহ-াড়ি ঢল ও ভূমিধস, চীনের অনেক অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধস, বাংলাদেশে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অবিরাম বৃষ্টির ফলে দীর্ঘ বন্যা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফল।

এই পৃথিবীর মানুষ সীমাহীন লোভে কাতর। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পেতে চায় সে। এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে গত ৫০ থেকে ১০০ বছরে মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করেছে, তা এর আগে ১০ হাজার বছরেরও বেশি সময়ে ব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করেছে। সম্ভবত প্রকৃতি আমাদের এই সীমাহীন লোভের পাপ স্খলনের সুযোগ দেয়ার জন্যই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন তারই একটা নমুনা। এই স্তরে যদি মানুষ তার অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে, প্রকৃতি হয়তো আর রুদ্র রূপ ধারণ করবে না।

১৯৮০'র দশক থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রতি বছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে গড়ে দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর উষ্ণতা এই গতিতে বাড়তে থাকলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে কুমেরস্নর বিস্তীর্ণ এলাকায় বরফ গলে যাবে। আমাদের কাছে হিমালয় অঞ্চলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "গঙ্গোত্রী হিমবাহসংলগ্ন প্রায় ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় বরফ গলে হিমবাহের গায়ে গর্ত বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।

আইপিসিসি (ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬২০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সমর্থন করেছে যে, "গত শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। আমাদের কাছে এই বৃদ্ধি সামান্য মনে হলেও আবহাওয়া জগতে এই বৃদ্ধি অসামান্য গুরুত্ব বহন করে।" এভাবে বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১৫৩ সেন্টিমিটার এবং ২১০০ সালে তা ৪৬০ সেন্টিমিটারে পৌঁছবে।
জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে স্থল ও জলজ জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিভিন্ন প্রতিবেশের ওপর যেমন– শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্কভূমির প্রতিবেশ, অভ্যন্তরীণ জলজ প্রতিবেশ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় প্রতিবেশ, কৃষি প্রতিবেশ, বন প্রতিবেশ, দ্বীপ প্রতিবেশ, পর্বত প্রতিবেশ, মেরুন্ন প্রতিবেশ প্রভৃতি।

সুমেরুন্ন অঞ্চলে বরফ গলার পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে গ্রিনল্যান্ডের বরফের ছাদ গলে যাবে, সাগরের উচ্চতা বেড়ে যাবে কয়েক মিটার এবং অনেকগুলো সর্বনাশা পরিবর্তন ঘটবে; প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের প্রায় ২৫ ভাগ হারিয়ে যাবে, স্তন্যপায়ী প্রাণী অবলুপ্তির অপেক্ষায় দিন গুনবে, প–াবিত হবে উপকূলবর্তী শহর–বন্দর–গ্রাম। পৃথিবীর নিম্নতর অক্ষাংশের দেশগুলোতে দেখা দেবে অতিবর্ষণ। অপরদিকে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে চলবে খরা, তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টি। পরিবর্তিত সেই আবহাওয়ায় ফসল উৎপাদনে দেখা দেবে বিপর্যয়, অরণ্য সম্পদ হবে অপ্রতুল। বাংলাদেশের মতো বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে ফসলহানির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫০ ভাগ।

ইতোমধ্যে যেসব পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে তাতে আগে বর্ণিত আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নেবে বলেই মনে হয়। ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা শূন্য দশমিক ৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে, যার প্রভাব পড়ছে সমগ্র বিশ্বে। বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০–২০ সেন্টিমিটার, সুইজারল্যান্ডের জমাটবদ্ধ বরফের সামগ্রিক আয়তন কমেছে প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ, সুমেরুন্ন অঞ্চলে গ্রীষ্ম–পরবর্তী সময়ে এবং প্রাক–শরৎকালে বরফের পুরুন্নত্ব কমেছে প্রায় ৪০% এবং কেনিয়ার পর্বতমালা থেকে ৯২% বরফ হারিয়ে গেছে আর কিলিমানজারো থেকে হারিয়েছে ৮২%।

আরো গুরুন্নত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে যেমন–

নাইজার নদী, চাঁদ হ্রদ এবং সেনেগাল নদীর বৃহৎ জলাশয়ের সমগ্র পানির পরিমাণ ৪০–৬০% কমে গেছে

৭০% বালুকাময় তটরেখার বিলুপ্তি ঘটেছে

আলাস্কার উত্তরাঞ্চলের বনভূমির প্রতি ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ১০০ কিলোমিটার উত্তর দিকে স্থানচ্যুতি ঘটেছে

সম্প্রতি বিলুপ্ত সোনালি ব্যাঙ এবং হারলেকুইন ব্যাঙকে ইতোমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম শিকার হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তন

১৬ নভেম্বর ২০০৭ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচন্ড শক্তিধর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। নাসার বিজ্ঞানীদের মতে এটা ছিল চার মাত্রার ঘূর্ণিঝড়। বঙ্গোপসাগরে এযাবৎকালে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে 'সিডর' ছিল সবচেয়ে তীব্রমাত্রার। এই ঘূর্ণিঝড় ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি শক্তিমাত্রার ছিল। আবহাওয়াবিদরা বলেছেন "জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে 'সিডর'–এর চেয়েও বেশি মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে।" ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'–এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার। চট্টগ্রামে এবার (২০০৭) মৌসুমের বৃষ্টিপাত অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত দুই বছরে দুই হাজার মিলিমিটারের নিচে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। এবারের বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় তিন হাজার মিলিমিটার। আর গত ১১ জুনের বৃষ্টিপাত ১০০ বছরে দেখা যায়নি। অতিবৃষ্টির ফলে চট্টগ্রামের নিচু এলাকা বারবার বন্যাকবলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে নদ–নদীগুলোর পানি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উঁচুতে প্রবাহিত হয়। ঘটেছে পাহাড় ধসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

প্রকৃতির এ ধরনের পরিবর্তনের মুল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন বলে মনে করছেন সংশি–ষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে 'বিশ্বেও জলবায়ুর দ্রুন্নত পরিবর্তন হচ্ছে। আর এর ফলে মৌসুমি বায়ু আগের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলে অতিবৃষ্টিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে।'

আমরা জানি বাংলাদেশের ঋতু ছয়টি। অর্থাৎ বছরে ছয় ধরনের আবহাওয়া। বৈশাখ–জৈষ্ঠ্য গ্রীষ্মকাল, আষাঢ়–শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র–আশ্বিন শরৎ, কার্তিক–অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ–মাঘ শীত আর ফাল্গুন–চৈত্র বসন্তকাল। খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া। কিন্তু বাস্তবে এখন আমরা কী দেখি? গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীত ছাড়া অন্য কোনো ঋতু তো বোঝাই যায় না। আবার আষাঢ়–শ্রাবণ বর্ষাকাল বলা হলেও অনেক সময় পুরো আষাঢ়ই থাকে শুকনো, মনে হয় তীব্র গ্রীষ্ম। কখনো আবার কল্পনার বাইরে বৃষ্টিপাত হয়। অন্য দিকে পৌষ মাসে শীত পাই না, কিন্তু ফাল্গুনে গিয়ে গরম কাপড় গায়ে চাপাতে হয়। আবহাওয়ার এই এলোমেলো অবস্থা আমরা অনুভব করছি কয়েক বছর ধরে। কিন্তু কেন এই এলোমেলো ভাব? এসব হচ্ছে আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। আবহাওয়ার সুত্রপাত যে জলবায়ু সেখানেই এক বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

আর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ হলো গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। বিশ্বের কয়েক শত শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও নীতিনির্ধারক বিভিন্নরকম গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন (বের হওয়া) বন্ধ করা সম্ভব না হলে ভূমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাষ দিয়েছেন : বর্তমান শতাব্দীতে ভূপৃষ্ঠের বায়ুর গড় তাপমাত্রা ১.৪ থেকে ৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং এর ফলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ২৮ থেকে ৫৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত । সাধারণ অবস্থায় সূর্য থেকে যে তাপশক্তি আসে, তার কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে আর বেশিরভাগ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে চলে যায়। বর্তমানে বায়ুমন্ডলে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও অন্যান্য গ্যাস জমে আছে তা ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত তাপ শোষণ করে এবং ভূমন্ডলের তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উপরিভাগ উত্তপ্ত হচ্ছে।

গ্রিনহাউজ এফেক্ট

আমরা প্রায়ই বলে থাকি 'গ্রিনহাউজ এফেক্ট'-এর কথা। এফেক্ট শব্দের বাংলা অর্থ প্রতিক্রিয়া। এই পৃথিবীকে সবুজ-সজীব রাখতে হলে বিভিন্ন গ্যাসগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকতে হবে। না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, আবার কোথাও কোথাও কমে যাবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষসহ পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদ।

বর্তমানে নানা কারণে বায়ুমন্ডলে গ্যাসগুলোর পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব বেশি করে বাড়ছে। এর ফলে মেরুর অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে। খরা, বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। দেখ গ্রিনহাউজের এই প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষই দায়ী। আমরা না জেনে ক্ষতিকর অনেক কাজ করে চলেছি। আমাদের গাড়ি, কলকারখানা প্রতিদিন যে ধোঁয়া বাতাসে ছাড়ে তাতে থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অনেক গ্যাস। বাতাসে এই সব গ্যাসের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বলে ক্ষতিকর। তবে পৃথিবীতে গাছপালা, বন বেশি থাকলে এই সমস্যা তীব্র হতো না। কারণ এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস আবার গাছপালার খুব প্রয়োজন। আমরা আমাদের নি:শ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ি। আর গাছপালা করে ঠিক তার উল্টোটা। গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং ছাড়ে অক্সিজেন, যা আমাদের খুব প্রয়োজন। এ জন্য এই পৃথিবীকে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন বেশি বেশি করে গাছ লাগানো এবং কলকারখানার কালো ধোঁয়া রোধ করা।

ওজোনস্তর

গ্রিনহাউজ গ্যাসের মধ্যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন নামে একটি গ্যাস আছে যা ওজোনস্তরের জন্য ক্ষতিকর। এখন বোঝা দরকার ওজোনস্তর বলতে কী বুঝায়।

ভূপৃষ্ঠের ওপরে ২০-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে বায়ুর একটি স্তর। এর বৈজ্ঞানিক নাম হলো স্ট্রাটোসফিয়ার, যা আমরা ওজোনস্তর নামে চিনি। ওজোনস্তরটি ওজোন গ্যাসে পরিপূর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় ওজোনস্তর ১৬ থেকে ৪৮ মিটার পুরু ওজোনকণা দিয়ে তৈরি।

সূর্য থেকে নানা ধরনের আলো এসে পৃথিবীতে পড়ে। এগুলোকে বলে আলোকরশ্মি। এর মধ্যে একটি হলো অতি বেগুনি রশ্মি বা আলট্রা ভায়োলেট রে। এই রশ্মি পৃথিবীর জীবের জন্য ক্ষতিকর।

ওজোনস্তরের কারণে পৃথিবীতে অতি বেগুনি রশ্মি আসতে পারে না। কারণ ওজোনস্তর ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মিকে ছাঁকন বা ফিল্টারের মতো ছেঁকে দেয়। ফলে এ রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কারণে আমরা অনেকেই ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ) ও এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার করছি। পচনশীল ফসল কোল্ড স্টোরেজে রাখছি। মশক নিধনে অ্যারোসল ব্যবহার করছি। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন, আমরা যেসব গ্যাস এসব যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করি তা ওজোনস্তরের জন্য ক্ষতিকর। এসব গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে আসার পর দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং প্রতিনিয়ত ওজোন কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে থাকে। এই গ্যাসগুলোর মধ্যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন অন্যতম। এই গ্যাস ওজোনস্তর খেয়ে ফেলে।

ওজোনস্তর ক্রমশ হালকা-পাতলা হয়ে যাওয়াকে আমরা বলে থাকি ওজোনস্তর 'ফুটো' হয়েছে। ওই ফুটো দিয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি অতি সহজেই ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করতে পারে। ফলে মানুষ আক্রান্ত হয় বিভিন্ন রোগে যেমন- ত্বকের ক্যান্সার, চোখের রোগ ইত্যাদি।

গে-াবাল ওয়ার্মিং

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হলো গে-াবাল ওয়ার্মিং। ভূপৃষ্ঠে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ভূপৃষ্ঠে বায়ুম□ল

আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ সূর্যের আলো ধারণ করবে। ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ গরম হতে থাকবে। এ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা গে-াবাল ওয়ার্মিং বা 'ভূম□লীয় উষ্ণতা' বলে থাকে। গে-াবাল ওয়ার্মিং হলে নিচের লক্ষণগুলো ফুটে উঠবে :

- পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুন্নতে বরফ গলতে শুরুন্ন করলে সমুদ্রেও পানি বাড়তে থাকবে

- অনেক দেশের নিচু এলাকা এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র চিরকালের মতো সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। মানুষ শরণার্থীর মতো দেশে দেশে আশ্রয় খুঁজবে।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও খরার প্রকোপ বাড়বে।

- উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে রোগ বাড়বে, জমিতে আগাছা বাড়বে ও ফসলহানি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ পানি আছে তার দুই ভাগ আছে বরফ হিসেবে। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বরফ গলে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে উপকূল, নিচু দ্বীপ ইত্যাদি নিচু এলাকা ডুবে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বেড়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ঝড়, সাইক্লোন, খরা ইত্যাদির মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। প্রচুর সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই মাত্রা চলতে থাকলে ক্ষতির মাত্রা আরো বাড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন বদলে দিচ্ছে আমাদের জীবন। এ কারণে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্পর্শে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে উঠছে। অতিমাত্রায় কার্বনযুক্ত গ্যাস নিঃসরণ, ভূমিক্ষয়, সর্বোপরি বৈশ্বিক উষ্ণতা এসবই আমাদের জলবায়ু বদলে দিচ্ছে। অনুন্নত দেশগুলোকে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সরবরাহ করার বিষয়টিতে ধনী দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিয়োটো চুক্তির আওতায় এ বিষয়ে একটি তহবিল গঠনের তাগিদও দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন হলে বাংলাদেশে যা ঘটবে

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ একটি দেশ। এখানে ২৬৬ প্রজাতির অভ্যন্তরীণ মৎস্য, ৪৪২ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য, ২২ প্রজাতির উভচর, ১২৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রজাতির স্থানীয় পাখি, ২৪০ প্রজাতির অতিথি পাখি, ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৫ হাজারের বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বনভূমি রয়েছে, যেমন পত্রঝরা বনাঞ্চল, চিরহরিৎ বনাঞ্চল ও প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল)। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন এ দেশে অবস্থিত। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় বিভিন্ন জলজ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

সব ধরনের জীবন ও জীবিকা জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী কৃষি ও মৎস্যজীবী। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও মৎস্য প্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে– বিশেষ করে গরিব সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শস্য চাষ কমে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে গেলে তা মানুষ ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। ধারণা করা হয়, এ কারণে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের সুন্দরী গাছের আগা-মরা রোগ হচ্ছে। ফলে সামগ্রিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলগুলো প-াবিত হবে। নদীপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং পানিতে লবণাক্ততা দেখা দেবে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরুন্ন অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। আশংকা করা হচ্ছে এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৫-১৭ ভাগ এলাকা সাগরে তলিয়ে যাবে এবং বাস্তুহারা হবে ২০-৩০ মিলিয়ন মানুষ। এ ছাড়া নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– হঠাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, খরা এবং নদীতীর বা মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে।

সম্ভাব্য প্রাথমিক পরিবর্তন–

ক প-াবন: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় ১২০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প-াবনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বাড়লেও দক্ষিণের দ্বীপগুলো ও সুন্দরবনের ২০ শতাংশ পানিতে তলিয়ে যাবে। এতে করে উলে-খযোগ্যসংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ এলাকা সমতল হলেও সব ভূমিই একই উচ্চতার নয়। জমিতে সামান্য কিছুটা উচ্চতা ভেদ রয়েছে। উচ্চতার তারতম্য রয়েছে বলে কোনো জমি বেশি, আবার কোনোটি কম প-াবিত হয়। বর্ষা মৌসুমে প-াবনের গভীরতাভেদে এ দেশের জমি পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু জমি শুকনো এবং বন্যার ভয়াবহতা থেকে অনেকটা মুক্ত। বাকি জমিগুলোকে সাধারণভাবে 'বন্যাপ্রবণ' জমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বন্যা এলে কমবেশি প-াবিত হয়; গভীরতা যত বেশি, স্বভাবতই ক্ষয়ক্ষতি সেখানে তত বেশি হয়।

জলবায়ু পরিবর্তিত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত বাড়বে। এতে বর্ষার নদীনালাতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, যা প্রকারান্তরে বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। এরই সাথে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে নদীতে পানির উচ্চতা আরো বাড়বে। সুতরাং বন্যার প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেবে। যেসব জমি কিছুটা উঁচু সেসব জমিও বানের পানিতে ভেসে যাবে। এতে বন্যাকবলিত এলাকার পরিসর বাড়বে। এ ছাড়া যেসব এলাকা একটু নিচু, সেখানে পানির পরিমাণ বাড়বে এবং বন্যা হবে ঘন ঘন। বন্যাকবলিত এলাকার পরিসর বেড়ে গেলে ক্ষতির ব্যাপ্তিও বাড়বে। বন্যায় কৃষিজ উৎপাদন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জানমালের ক্ষতি হবে এবং ভৌত অবকাঠামো নষ্ট হবে। দেশে যদি যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় এবং বন্যা উপদ্রুত অঞ্চলের নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়, তবে হয়তো কিছু কিছু অঞ্চল বন্যামুক্ত রাখা যাবে, কিন্তু বাঁধের বাইরের এলাকার বিপন্নতা ও ক্ষতির পরিমাণ অনেক বাড়বে।

খ নদীর ক্ষীণপ্রবাহ : নদীমাতৃক এবং কৃষিপ্রধান একটি দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে কৃষিতে সেচ দেয়া ও নৌ চলাচলের জন্য নদীতে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ একান্তই দরকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণপ্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। সামুদ্রিক লোনাপানি উজানে প্রবেশ করায় কৃষিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠাপানির অভাব দেখা দেবে এ ছাড়া মৎস্যসম্পদেরও সমূহ ক্ষতি হবে।

গ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি : বর্তমানে নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং দুরবর্তী দ্বীপগুলোর ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনাপানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি মাটির উর্বরাশক্তিকে হ্রাস করে, এতে ফলন কমে যায় এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা উপকূলীয় অঞ্চলের শিল্প কল-কারখানারও ক্ষতি করছে। অধিকন্তু, ঐ এলাকার অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ও মাটিতে অধিক হারে লবণাক্ততা বাড়বে। বিশেষত নদ-নদীর মোহনায় অবস্থিত দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অধিক পরিমাণ লোনাপানি প্রবেশ করবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি উপকূলীয় পরিবেশকে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এক দিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে যেমন লোনাপানি প্রবেশ করবে অন্য দিকে নদ-নদীর ক্ষীণপ্রবাহের কারণেও সামুদ্রিক লোনাপানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করবে। এই দু'টি প্রক্রিয়ার সম্মিলিত অভিঘাতে উপকূলীয় অর্থনীতি পর্যুদস্ত হবে এবং এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

ঘ আকস্মিক বন্যা : পাহাড়ি বৃষ্টিপাতের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতি বছর আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। মৌসুমি বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলে হঠাৎ করে নদ-নদীর পানি বাড়িয়ে দেয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১ হাজার ৮০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার।

পাহাড়ি এলাকার বৃষ্টিপাতের বার্ষিক পরিসংখ্যান ও সুরমা, কুশিয়ার, মনু ও খোয়াই নদীর পানিপ্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে, প্রতি দুই-তিন বছর পরপর বাংলাদেশে এ রকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। সাধারণত, মে থেকে জুন মাসের মধ্যে ওই অঞ্চলগুলোতে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এ ধরনের বন্যায় কৃষির মারাত্মক ক্ষতি হয়, এ ছাড়াও যোগাযোগ অবকাঠামো বিপর্যস্ত হয়। জলবায়ুর পরিবর্তনে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ বেড়ে যাবে, যার ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা বাড়বে। পরিবর্তিত আবহাওয়া পরিস্থিতিতে এরই মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যার পর গ্রামাঞ্চলের অনেক গর্তবাসী জীববৈচিত্র্যের সংখ্যা কমে গেছে।

ঙ খরার প্রকোপ : কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীয় বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বণ্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোনো অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসলহানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে রোপা আমন আবাদের অসুবিধা হয় এবং ধানের ফলনও খুব কমে যায়। আর শীত মৌসুমেও বৃষ্টিপাতের তুলনায় অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবনের কারণে মাটির আর্দ্রতা কমে যায় এবং রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে খরার কারণে সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দেখা দেয় খাদ্যাভাব; বাড়ে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা এবং নানা প্রকার সামাজিক সঙ্কটের উদ্ভব হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত যেসব এলাকা রয়েছে অদূরভবিষ্যতে তা মারাত্মক খরাকবলিত এলাকায় পরিণত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চ সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের উদ্ভব হয়। যদিও ঘূর্ণিঝড়ের পেছনে একাধিক কারণ ও একটি জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে তবু পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশে প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় জেলাগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে বায়ুম□লের গড় তাপমাত্রা বাড়বে। একই সাথে বাড়বে সামুদ্রিক ঝড়ের পৌনঃপুনিকতা ও প্রচ□তা। সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বাড়লে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও বিপন্ন লোকের সংখ্যাও বাড়বে আনুপাতিক হারে।

ছ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙন ও ভূমি গঠন : বাংলাদেশে মোট ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র তটরেখা রয়েছে। এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূল

ঘিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার, আর কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত হলো ৮৫ কিলোমিটার। সমুদ্র উপকূল বরাবর আরো রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত প্রশস্ত জোয়ারভাটা সমভূমি (ঞরফধষ চষধরহ) এবং অসংখ্য নদী মোহনার ব-দ্বীপ। হাজার হাজার বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙা-গড়া চলছে। কখনো কোনো অংশ ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছে আবার অন্য অংশে চলছে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া। নদী সঙ্গমের ব-দ্বীপগুলো ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখন্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তবে এ নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যেও ভারসাম্য অবস্থা বিদ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভাঙা-গড়ার এই ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিক্ষয় ও নদীভাঙন বেড়েছে। অধিকন্তু চট্টগ্রামের সমুদ্র তটরেখা সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং ভূ-ভাগের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। সমীক্ষায় অনুমান করা হয়েছে, প্রতি ২ সেন্টিমিটার সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলীয় তটরেখা গড় ২-৩ মিটার স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হলে ২০৩০ সাল নাগাদ মূল ভূ-খন্ডের ৮০ থেকে ১২০ মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করবে এবং কালক্রমে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। একই সাথে হারিয়ে যাবে দেশের সব চেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র, যা বিদেশে দেশের পরিচিতি আনে এবং অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখে।

জ জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক দিক আমাদের মিলেনিয়াম টার্গেট অর্জনে বাধা : প্রলয়ঙ্কারী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, সাধারণ দুর্যোগ জলোচ্ছ্বাস এ ধরনের দুর্বিপাক আমাদের মিলেনিয়াম টার্গেট অর্জনের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলরোয়া বন উজাড় হওয়া, অপর্যাপ্ত হারে কার্বন শোষণ হওয়া, মাটিক্ষয়, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ইত্যাদি ঘটছে এই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। বাস্তব কারণেই অনুন্নত দেশগুলো এই প্রযুক্তি গ্রহণের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম নয়।

আমাদের করণীয়

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম জলবায়ুর পরিবর্তন হলে কী ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণদের জন্য বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাদের সামনে পড়ে আছে পুরো ভবিষ্যৎ। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। নিজের আওতার মধ্যেই অনেক অর্থবহ কাজ করা সম্ভব যেমন- অ্যারোসল, এয়ারফ্রেশনার, ফোম, এয়ারকন্ডিশনার কম ব্যবহার করা। আর ব্যবহার করলে যেন 'ওজোনবান্ধব' গ্যাস ব্যবহার করা হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে অভিভাবকদের সচেতন রাখা।

সাধারণভাবে সবারই এ কথাগুলো মনে রাখা জরুরি :

* ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, কোল্ড স্টোরেজে 'ওজোনবান্ধব' গ্যাস ব্যবহার করতে হবে;
* অ্যারোসল, এয়ারফ্রেশনার, ফোম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত সিএফসি গ্যাস প্রত্যাহার করে ওজোনবান্ধব গ্যাস চালু করতে হবে;
* জ্বালানি বাঁচাতে হবে।
* একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে আপনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন উলিস্নখিত দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে
* প্রয়োজনের বেশি জ্বালানি একদম ব্যবহার করবেন না। রেডিও-টেলিভিশন বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক বিনোদন সরঞ্জাম না দেখলে বা না শুনলে বন্ধ করে রাখতে হবে। কেউ কক্ষে উপস্থিত না থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, এয়ারকন্ডিশনার সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখুন, কেননা 'স্ট্যান্ডবাই' আবস্থায়ও এসব সরঞ্জামে বিদ্যুৎ খরচ হয়;
* মোবাইল ফোন চার্জার বা ব্যাটারি ব্যবহারে না থাকলে প-াগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখুন;
* অল্প সময়ের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার না করলে 'স্লিপ মোড'-এ রাখাই শ্রেয়, কারণ এক ঘণ্টার মধ্যে বারবার চালু করা হলে সরঞ্জামটির ক্ষতি হতে পারে।

তবে এক ঘণ্টা বা এর চেয়ে বেশি সময় ব্যবহার করা না হলে সেটি পুরোপুরি বন্ধ করে দিন

* পানির হিটারের থারমোস্টেট ১০০-১১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখুন;
* রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখুন;
* পানি কম ব্যবহার করুন, কারণ পানির পাম্পের জন্য যথেষ্ট বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়;
* ওয়াশিং মেশিন যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করুন, এতে পানি এবং বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে। মনে রাখবেন পরবর্তী "বিশ্বযুদ্ধ" পানির সঙ্কট নিয়েই বাধতে পারে;

* এয়ারকন্ডিশনার যত কম ব্যবহার করা যায় তত ভালো;

* সম্ভব হলে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করুন। এই শক্তির উৎস বায়োগ্যাস, সূর্যের আলো, বায়ু বা জলবিদ্যুৎ। এর মধ্যে বায়োগ্যাস তৈরি সবচেয়ে সহজ। রান্নাঘরের ফেলে দেয়া আবর্জনা এবং মানুষ বা পশুর বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস তৈরি হয়। বায়োগ্যাস আমাদের তাপ সরবরাহ করতে পারে এবং বর্জ্য ও রোগবালাই মুক্ত সুস্বাস্থ্য ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে;

* জ্বালানি বাঁচাতে একই গন্তব্যে চারজন চারটি গাড়িতে না গিয়ে একটি গাড়িতে যেতে পারেন। ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে সুযোগমতো জনপরিবহন যেমন বাস, ট্রেন ব্যবহার করুন, এতেও জ্বলানি বাঁচানো সম্ভব;

* রান্না ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হলে রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখতে বলুন। এতে আমাদের অমুল্য গ্যাস সম্পদ আরো কয়েক বছর বেশি মজুদ থাকবে। এই গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়;

* বেশি বেশি করে গাছ লাগান, অ্যাপার্টমেন্টে থাকলে বারান্দায় টবে গাছ লাগাতে উদ্যোগী হোন;

* যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া রোধ করার কথা বলুন;

* যেসব ফসল স্বল্প সময়ে বন্যার আগে তুলে ফেলা সম্ভব সেগুলো বেশি করে চাষাবাদ করতে বলুন;

* স্থানীয় জাতগুলো চাষাবাদে উৎসাহিত করুন যেসবের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি;

* লবণাক্ত এলাকায় সহনীয় ধান বা শস্যের উদ্ভাবন ও আবাদের প্রসার ঘটানোর পক্ষে কথা বলুন;

* দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কচুরিপানার ভাসমান ধাপে সবজি ও বীজতলায় চাষাবাদ বাড়ানোর কথা বলুন, যার ফলে আগাম বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

***